দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP 07.1999

পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

সর্বোচ্চ শিক্ষার বেহাল অবস্থা

দেশ গড়ার সকল স্তম্ভই একে একে কালিমালিপ্ত হয়ে পড়েছে। শিক্ষাই তো মানুষকে মানুষ করে গড়ে তুলে তার ভিতরে লুক্কায়িত অবিনাশী শক্তিকে প্রজ্বলিত করে। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার সাথে বলতে হয় একদিন যাঁদের শ্রদ্ধার সঙ্গে মানুষ গড়ার কারিগর বলে অভিহিত করা হতো, আজ তাঁদের অনেকেই আর পাঁচটি পেশার মানুষের মতো গড্ডলিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছেন। তাঁরা এখন বাঁধা মাইনায় সন্তুষ্ট না হয়ে অধিকতর বিত্তবৈভবের দিকে নজর দিচ্ছেন। শিক্ষার সর্বোচ্চ অঙ্গন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সম্পর্কে এই জাতীয় কথাবার্তা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে যা মোটেই সুখকর অথবা সমাজদেহের সুস্বাস্থ্যের কথা বলে না। গত রবিবার 'শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, সেশন জট ও শিক্ষকদের শৈথিল্য শিক্ষার মানের অবনতির জন্য দায়ী' এই শিরোনামে জনকণ্ঠের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক নিয়মিত লাইব্রেরিতে যান না। যে স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক লাইব্রেরি ব্যবহার করেন তাঁরা পড়ার জন্য ধার নেন গল্প-উপন্যাস, কোন পাঠ্যপুস্তক নয়। ছাত্রছাত্রীদেরও মাত্র ১৩/১৪ শতাংশ নিয়মিত লাইব্রেরি ব্যবহার করে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা পাস করে সিনিয়র ছাত্রদের পুরনো নোট পড়ে। 'শিক্ষার মান ও শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ঃ ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কেস স্টাডি' শিরোনামে এই গবেষণাটি পরিচালনা করে শিক্ষা প্রকল্পন ও উন্নয়ন গবেষণা ফাউন্ডেশন (ফ্রেডপ)। শনিবার পলাশীতে ফ্রেডপ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করে গবেষক দলের নেতা ডঃ কাজী খলীকুজ্জামান বলেন, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ (৮০%) ছাত্রছাত্রী দ্বিতীয় বিভাগে পাস করছে, পঠিত বিষয় সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে তাদের ধারণা যথেষ্ট নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর ভাষাজ্ঞানও ভাল নয়, এমনকি বাংলা ভাষায়ও তারা দুর্বল। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, সেশনজট, প্রশাসনিক দুর্বলতা, শিক্ষকদের শৈথিল্য, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশে মারাত্মক বিলম্ব প্রভৃতি বিষয়কে ডঃ খলীকুজ্জামান শিক্ষার মানের অবনতির জন্য দায়ী করেন। আলোচনা সভায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তো সোজা-সাপটা ভাষায় বলেই ফেলেছেন, উচ্চ শিক্ষায় ফাঁকি ঢুকে পড়েছে, ছাত্ররা টেক্সট বই পড়ে না, নোট মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করে। শিক্ষকরাও ছাত্রদের সুযোগ করে দিচ্ছেন নানাভাবে। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই আসলে দাঁড়িয়ে আছে ফাঁকির ওপরে।

কথাগুলো আমাদের বিবেককে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়। কাদের সম্পর্কে এ কথাগুলো বলা হচ্ছে? 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' নামে পরিচিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ ও বরেন্দ্র সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় শিক্ষকদের সম্পর্কে। এখানে অনেক জ্ঞানীগুণী বক্তার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, জাতীয় অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হক ও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় ক্যাম্পাসে এক শ্রেণীর ছাত্রের রাজনীতির নামে সন্ত্রাস ও অন্য অন্ধকার দিকগুলো উঠে এসেছে। অথচ আজ থেকে তিন-চার দশক আগে এই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় সত্যই শিক্ষার আদর্শ পাঠস্থান ছিল। এখানে শিক্ষক ও উপাচার্যের মধ্যে সারা উপমহাদেশখ্যাত অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানীগুণী জন ছিলেন। আজ সে কথা স্মরণ করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া মনে হয় আর কোন গত্যন্তর নেই। জাতির সর্বোচ্চ শিক্ষার আসনের অবস্থাই যদি এই হয় তাহলে বিভিন্ন জেলা শহর, উপজেলা ও গ্রাম-গ্রামান্তে গড়ে ওঠা স্কুল-কলেজগুলোর পঠন-পাঠন পরিবেশ কেমন হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি জরুরী বিষয় আলোচনা করা প্রয়োজন– যা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামানের অবনতির জন্য কম দায়ী নয়। সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম চাকরি প্রসঙ্গ। গত আগস্ট ১৩ তারিখে একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম চাকরি বন্ধ হচ্ছে না।

কর্তৃপক্ষ বরং এ ধরনের কাজে যুক্ত হওয়ার আগে শিক্ষকরা যেন প্রশাসনের অনুমতি নেন সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে চান। এর উদ্দেশ্য– কর্তৃপক্ষ চায় কনসালটেন্সি বা পার্টটাইম চাকরি থেকে শিক্ষকদের অর্জিত আয়ের একটা অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাগারে জমা পড় ক। এ বিষয়টির ব্যাপকতা যাচাইকল্পে গত জুনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০টি বিভাগ ও ইন্সটিটিউটে ১৯ দফা সুপারিশমালা পাঠিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। উত্তরদানের সময়সীমা ছিল জুলাই ১৫। অথচ ১ জুলাই পর্যন্ত মাত্র দু'টি বিভাগ এ সম্পর্কে মতামত দেয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধানরা তাদের সহকর্মীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন কাজে তেমন আগ্রহী নন। তা ছাড়া তাদের অনেকে নিজেরাই এ ধরনের কাজে জড়িত। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানী ও সুপণ্ডিত বলে পরিচিত শিক্ষকেরা এ ধরনের কাজের সুযোগ বেশি পান বলে তারাও এ ব্যাপারে তেমন উচ্চবাচ্য করেন না। এখানেও সর্ষের মধ্যে ভূত। এ যদি হয় সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গনের বাস্তব রূপ তা হলে জাতি আগামীতে কোন্ সম্পদ নিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে নেতৃত্ব দেবে? কিন্তু শিক্ষাঙ্গনের এই ভূত তাড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। সমাজের আর দশজনকে সুবচন বিতরণের আগে এই জ্ঞান ব্যবসা বন্ধ করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি শোভনীয় নয়।